৬৫

সংবাদ

তারিখ ... JUL 24 2006 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারে করণীয়

অধ্যক্ষ গোলসান আরা বেগম

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মধ্যে সেতুবন্ধনকারী গাঁথনটিই হলো মাধ্যমিক স্তর। নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার এ পর্যায়ে ১৪-১৫ বয়সের ছেলেমেয়েরা অধ্যয়ন করে। এ স্তরের পড়াশোনা শেষ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সীমানির্ধারণী একটি পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। যারা কৃতকার্য হতে পারে তারা সাধারণ শিক্ষার সীমানা নির্ধারণী সম্পদ হিসেবে এসএসসি সনদ, মাদ্রাসার ক্ষেত্রে দাখিল, কারিগরি শিক্ষার সনদ হিসেবে ভোকেশনাল সনদ ও ইংরেজি মাধ্যমে পায় ও লেভেল সনদ। এসএসসি পরীক্ষাটি বাংলাদেশ সরকার ৬টি সাধারণ বোর্ড, দাখিল পরীক্ষা একটি মাদ্রাসা বোর্ড, ভোকেশনাল পরীক্ষা একটি কারিগরি বোর্ডের তত্ত্বাবধানে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রতিটি পরীক্ষা স্থানীয় প্রশাসন পুলিশি ও ম্যাজিস্ট্রেসি সহায়তাসহ প্রশ্নপত্রের জিম্মাদার হিসেবে কাজ করে থাকে। বোর্ড নির্ধারিত পরীক্ষা কেন্দ্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকরা পরীক্ষা গ্রহণ, খাতা মূল্যায়ন, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও নম্বর টেবুলেশন থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশে বোর্ডকে সহায়তা প্রদান করে। চূড়ান্ত পাস-ফেলের ফলাফল ঘোষণা শেষে নম্বরপত্র ও মূল সনদপত্র প্রদানের দায়িত্বটি নিজ নিজ বোর্ডকে বহন করতে হয়।

ও লেভেল পরীক্ষাটি একটি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সনদ প্রদান করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একই সময়েও একটি নির্ধারিত প্রশ্নপত্রে এ পরীক্ষা গ্রহণ করে। ব্রিটেনের লন্ডনকেন্দ্রিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে ব্রিটিশ কাউন্সিল এই পরীক্ষার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে। ব্রিটিশ কাউন্সিল পরীক্ষা গ্রহণ, রেজিস্ট্রেশন, ফল প্রকাশ ও সনদ প্রদানের ক্ষেত্রে সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করে থাকে। তবে মূল সার্টিফিকেট, নম্বরপত্র প্রদানসহ ও লেভেল শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক কার্য প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখে ব্রিটেনের লন্ডন কেন্দ্র। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা ব্যবস্থার দশটা শ্রেণী অতিক্রমকারী শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ, মাদ্রাসা, কারিগরি শিক্ষার কোন সামঞ্জস্য তো নেই-ই এমনকি সরকারেরও কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। বিদেশী ধ্যান-ধারণায় ঠাসা এ শিক্ষার ব্যয়ভার অত্যন্ত বেশি। বাস্তবে দূরে থাক স্বপ্নেও নিম্ন আয়ের বা তারও কম অর্থ উপার্জনকারী মানুষ ও-লেভেল শিক্ষা গ্রহণের কথা চিন্তা করতে পারবে না। এ শিক্ষার পাঠ্যসূচি, বিষয়বস্তু, সিলেবাস ইত্যাদি সমৃদ্ধশালী হলেও প্রচলিত শিক্ষার মতো ঐতিহ্যময়ী নয়। তারপরও ধনিক, বণিক ও এলিট সম্প্রদায়ের কাছে এই শিক্ষা অধিক গ্রহণযোগ্য। যোগ্য বলেই স্তরে স্তরে সাজানো বই পেন্সিল কাঁধে ঝুলিয়ে হিমশীতল গাড়িতে চড়ে ধনীর সন্তানরা এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৌঁছে যায়। ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ভৌত সুবিধাটি আকর্ষণীয় ও নয়নকাড়া। ইন্টারনেট প্রযুক্তি, কম্পিউটার সুসজ্জিত ও হিমশীতল ক্লাসরুমে বসে এ ধরনের শিক্ষা গ্রহণ করতে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের তেল পানিও ঢালতে হয় প্রচুর অর্থাৎ অর্থ ব্যয় করতে হয় কাড়ি কাড়ি। ধানমন্ডি, উত্তরা, বারিধারা, গুলশান ও বনানীসহ ঢাকা শহরের অভিজাত এলাকায় এসব প্রতিষ্ঠান মাথা উঁচু করে স্বগর্বে দাঁড়িয়ে আছে ধনীদের সন্তানদের শিক্ষা বিতরণের প্রত্যাশা নিয়ে। বিদ্যালয়গুলোর নিয়োগ পদ্ধতি ও পরিচালনা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক স্ব-নির্ধারিত। ইংরেজি স্কুল স্থাপনে সরকারি অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। বিভিন্ন স্কুলের মধ্যে কোন অন্তঃসম্পর্ক নেই। গলা কাটা বেতন আদায় করলেও কেউ কোন প্রতিবাদ করতে পারে না। এ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার জনপ্রিয়তা ও সুষ্ঠুতা বৃদ্ধির জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার। এ উদ্দেশ্যে সরকারি মহলে বিভিন্ন পরিকল্পনাও চলছে। তবে আরও গুরুত্বের সঙ্গে পদক্ষেপ প্রয়োজন।

সাধারণ শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তরে রয়েছে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা নামক বিভাজন নবম ও দশম শ্রেণীতে। অপেক্ষাকৃত বেশি মেধাবী শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিভাগে অধ্যয়ন করে থাকে। এরাই পরবর্তী পর্যায়ে উচ্চ মাধ্যমিক সনদ (বিজ্ঞান বিভাগে) অর্জনের পর ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং বা সম্মান পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার যে কোন বিভাগে ভর্তি হতে পারে। সাধারণ শিক্ষার এ স্তরে বিভাগ বিভাজনের পদ্ধতিটির বিলুপ্তি ঘটিয়ে একমুখী নীতি প্রবর্তনে সরকারের প্রস্তাবটি রয়েছে প্রক্রিয়াধীন। রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে মাধ্যমিক স্তরের একমুখী নীতি প্রবর্তনের প্রক্রিয়াটি শিক্ষার সুদূরপ্রসারী উন্নয়নে কতটুকু সফল বয়ে আনবে তা চিন্তা করার ব্যাপার।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে বাস্তবায়নে জড়িত স্কুলগুলোর মধ্যে রয়েছে ভৌত অবকাঠামোগত, পরিচালনা পদ্ধতি, অর্থনৈতিক সুবিধাদি, সামাজিক প্রেক্ষাপট ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়ে সামঞ্জস্যহীনতা। শহরের বিশেষ করে ঢাকা শহরের পরিবেশে নামিদামি স্কুলগুলোর সুরম্য অট্টালিকায় সুসজ্জিত পরিবেশে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দিয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে টিউশন ফিসহ আনুষঙ্গিক বেতনাদি যেমন বেশি ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করানোর ব্যাপারে কেয়ারিং-শেয়ারিংয়ের দায়িত্বটি প্রশংসনীয়। তাই তো পরীক্ষার ফলাফলের দিক দিয়ে বরাবরই থাকে শহরের প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্রগামী অবস্থানে। অভিভাবকরাও তাদের সন্তানটিকে এ সব বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে স্বস্তিবোধ করেন। শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করানোর পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক কার্যাবলিতেও রয়েছে তাদের পারঙ্গম অবস্থান। একজন শিক্ষার্থীকে সুস্থ, দক্ষ, কর্মঠ, নিষ্ঠাবান ও সৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য রয়েছে তাদের প্রাণান্ত প্রচেষ্টা ও অনুকূল পরিবেশ। তাই তো এসব বিদ্যালয়ে ভর্তি মৌসুমে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয় ছাত্রছাত্রীরা। অভিভাবকরা তার প্রাণপ্রিয় সন্তানটিকে কাঙ্ক্ষিত বিদ্যালয়ে ভর্তি করাতে পারলে নিশ্চিন্তে ও স্বস্তিতে ঘুমাতে পারেন।

বাংলাদেশের পঁচাশি ভাগ মানুষ গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার জন্য রয়েছে গরিষ্ঠসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের ভৌত কাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা হতাশাজনক। সরকারি সহযোগিতা প্রতিনিয়ত অব্যাহত থাকলেও কিছু জটিল ও দুর্বোধ কারণে গ্রামাঞ্চলে প্রসারিত এ স্তরের শিক্ষা মাধ্যমটি নানা সমস্যায় আক্রান্ত। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞানাগার থাকলেও বিজ্ঞানাগারের যন্ত্রপাতি কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ের নেই। অভিজ্ঞ শিক্ষক থাকলেও হয়তো-বা ট্রেনিংপ্রাপ্ত শিক্ষক নেই। নিয়োগ প্রক্রিয়াটি স্থানীয় ম্যানেজিং কমিটির আওতাধীন বিধায় রাজনৈতিক ও স্থানীয় প্রভাবের কারণে দক্ষ শিক্ষক হয়তো-বা নিয়োগ পান না। তাছাড়া রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্বল ব্যবস্থাপনাসহ দক্ষ সমন্বয়হীনতার জন্য গ্রামাঞ্চলের এ স্তরের শিক্ষা ছাত্রছাত্রীদের কাছে আকর্ষণ হারাচ্ছে। তাই তো প্রতিবছর বেশকিছু বিদ্যালয় থেকে এসএসসি পরীক্ষায় একজন পরীক্ষার্থীও কৃতকার্য হতে পারে না। অপরপক্ষে শতভাগ পরীক্ষার্থী পাস করছে এমন কোন প্রতিষ্ঠানও খুঁজে পাওয়া যায় না। তার কারণ কি কি, তা চিহ্নিত করা ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা খুবই জরুরি।

গ্রামাঞ্চলের আলোছায়ায় প্রসারিত মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরটিকে আরও গতিশীল এবং প্রাণবন্ত করার জন্য রাজনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ধরনের মোটিভেশন সেমিনারের আয়োজন করা যেতে পারে। কেন ছাত্রছাত্রীরা ফেল করে, অবার কেনই-বা দুর্বল শিক্ষার্থীরা শিক্ষা গ্রহণে বিমুখী, অনগ্রহী এই সব তথ্য ও মত উদ্ঘাটনে গবেষণা প্রয়োজন। সরকারি মনিটরিং কার্যক্রমকে ম্যানেজিং কমিটি বা সামাজিক সংগঠনগুলোর উৎসাহিত ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে পারে। কেন বিদ্যালয়ে আসার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একজন শিক্ষার্থী বই খাতা ফেলে দিয়ে বাজারে বা স্থানীয় কোন ভিডিও দোকানে কম্পিউটার গেমস খেলে বা সিনেমা দেখে সময় নষ্ট করে? কেনই-বা দশটি বছর ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনা করার পর এসএসসি পরীক্ষার সিঁড়িটি ডিঙাতে পারে না? এরাই বেকারত্বের বোঝা ভারি করে ও তৈরি করে সামাজিক বিশৃঙ্খলা, নানা ধরনের জটিলতা অবক্ষয়। অভিভাবককে যৌথভাবে এই সব অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যাধির বিরুদ্ধে দৃষ্টিনিবদ্ধ করতে হবে।

স্কুল পর্যায়ে কর্মরত অধিকাংশ শিক্ষকরা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, দুর্মূল্যের বাজারে আয় ও ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা রাখতে না পেরে মানসিকভাবে থাকে বিপর্যস্ত। যে বেতনাদি পান তা দিয়ে নুন কিনতে পানতা ফুরায়। অতিরিক্ত সাধ-আহ্লাদ মেটাবেন কি করে। শিক্ষকতা পেশার পাশাপাশি কোচিং, কৃষিজমি চাষ, ব্যবসা অথবা অর্থ উপার্জনকারী আরও একটি পেশা নির্বাচন করেন পারিবারিক ও অর্থনৈতিক ঘাটতি পুষিয়ে নিতে। তাই মানসিক কর্মব্যস্ততার কারণে শিক্ষকরা শ্রেণী পাঠদান কাজে অধিক গুরুত্ব দিতে পারেন না। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে তৈরি হয় নৈরাজ্যজনক অবস্থা। আন্তরিকতার অভাবে ও অবহেলায় দুর্বল-অলস প্রকৃতির শিক্ষার্থীরা হয়ে পড়ে অমনযোগী-অনাগ্রহী। এ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে শিক্ষকদের বেতন কাঠামোতে পরিমার্জন ও পরিবর্ধন সাধন করে অর্থনৈতিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি করতে হবে। অন্যান্য পেশাজীবীর মতো দিতে হবে অন্যান্য কাম্য সুযোগ-সুবিধা।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে হলে এর প্রতিবন্ধকতা, অসুবিধা, সুবিধাগুলো চিহ্নিত করে গবেষণা করতে হবে। গবেষণালব্ধ ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে করণীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলে দক্ষতাও মেধার সমন্বয়ে তবেই মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রসারতা পাবে। গ্রামাঞ্চলের অশিক্ষিত, দরিদ্র, রিকশাওয়ালা, ঠেলাগাড়ির শ্রমিক ও নিম্ন আয়ের জনগণ জানে না তার সন্তানটিকে শিক্ষার মাধ্যমিক স্তরে মানবিক বা বিজ্ঞান বা ব্যবসায় শাখা পড়ালে ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের রূপ রেখা কেমন হবে।

অজ্ঞতার কারণে তারা জানে মাদ্রাসায় পড়ালে তার সন্তানটি আচরণে ব্যবহারে উৎকৃষ্ট নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন বড় মাওলানা হবে।

কিন্তু তারা জানে না, এই মাধ্যমে পড়লে মস্ত বড় স্বাস্থ্যসেবক হিসেবে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার অথবা বৈজ্ঞানিক হতে পারবে না। তাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেয়ার জন্য ইউনিয়ন পর্যায়ে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয়ভাবে সেমিনার করে বা অভিভাবক সমাবেশ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে জনপ্রিয় করা যেতে পারে।

শুধু নামিদামি প্রতিষ্ঠানের স্বর্ণালি ফলাফলের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ না রেখে দেশের বৃহৎ জনসম্পদের শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে হলে গ্রামাঞ্চলে দৃষ্টি ফেরাতে হবে। এ কাজটি বাস্তবায়নে সরকারি একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়, ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবকসহ রাজনৈতিক, সামাজিক ও এনজিও সংগঠনগুলোকে সহমর্মিতা-সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে এবং গ্রহণ করতে হবে যৌক্তিক পদক্ষেপ, কর্ম পরিকল্পনা।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্য চেয়ার টেবিল বেঞ্চের অসুবিধা, বই পত্রের অভাব, অভিজ্ঞ শিক্ষক সেসঙ্গে আছে দুর্বল ম্যানেজমেন্ট, শিক্ষকদের দৃঢ় মনোবল বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত শিক্ষা প্রশিক্ষণের অভাব। তারপরও জাতি হিসেবে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে এ স্তরের শিক্ষাকে সর্বস্তরের জনগণের কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নিয়ে যেতে সরকারসহ শিক্ষক অভিভাবক ও সামাজিক সংশ্লিষ্টতা হতে হবে আন্তরিক। তবেই এ মাধ্যমিক মুঠো মুঠো শিক্ষার আলো বিতরণ করে অজ্ঞতার আঁধার করতে পারবে দূর।